ওয়েসিস অফ দ্যা সিস

ওয়েসিস অফ দ্যা সিস

মাসউদ আহমাদ

মাকতাবাতুল হাসান

ওয়েসিস অফ দ্যা সিস

প্রথম সংস্করণ : জুন ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত
ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : মুহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ

ISBN : 978-984-8012-01-7

মূল্য : ১৮০/- টাকা মাত্র

Oasis of the Seas
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

সূ চি প ত্র

ওয়েসিস অফ দ্যা সিস ১১
হোয়াঙহো অববাহিকায় ৩০
ভলগার পাড়ে ৪৯
কিউবা একটি দেশ ৬৫
সেই দেশ আমেরিকা ৮৩

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

ভূ মি কা

প্রাথমিক শৈশবে একটিই স্বপ্ন ছিল। কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলেছি, পাইলট হব। জানি না, পাইলট হবার বাসনা কীভাবে আমার মনে তৈরি হয়েছিল। তারপর স্কুল ছেড়ে মাদরাসায় চলে গেলাম। পরবর্তী শৈশব নতুন স্বপ্ন নিয়ে হাজির হলো। আমি কোরআনে কারীমের হাফেয হতে চাইলাম। পাইলট হবার ইচ্ছের কথা কীভাবে জানি ভুলে গেলাম! লেখক হওয়া আমার জীবনের সর্বশেষ তিনটি স্বপ্নের একটি। আমি আমার জীবনের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি, একজন জ্ঞানী লেখক হওয়া মানে তার সিঁড়ির তিনটি ধাপের দ্বিতীয় ধাপে আমার আরোহণ।

আমার জীবনের দ্বিতীয় সফলতা, একথা প্রতিষ্ঠিত হওয়া যে– আমি একজন লেখক। কোরআনের হাফেয হওয়ার মাধ্যমে প্রথম সফলতা অর্জন করেছিলাম। অনেক স্বপ্ন দেখেছি। অনেক কিছুই হতে চেয়েছি। জীবনের জন্য কতই পরিকল্পনা করেছি! জীবনের ভবিষ্যতের অনেক মানচিত্র আমি এঁকেছি। শুধু পারিনি যাকিছু চেয়েছি সব হতে। পারিনি যে গন্তব্যগুলো কল্পনা করেছি সে সবখানে পৌঁছতে। চেয়েছি লেখক হতে, তা প্রায় হয়ে গিয়েছি, কেবল বাকি বইটি প্রকাশ হওয়া।

এক সময় আমি লিখতে চেয়েছি বিষয়ভিত্তিক লেখা, হুজুর বলেছিলেন, এখনই না। তো, কী লিখব? শুধু তো রোযনামচাই লিখি। কবিতা লিখে যাব? জ্ঞানের গভীরতা ছাড়াও সেরা কবিতা লেখা সম্ভব। মনে একটু ভাব এবং ছন্দ-জ্ঞান থাকলেই চলে। হুজুর বলেছিলেন– না, কবিতা না। কবিতার চেয়ে সাধারণ লেখাগুলোই তোমার ভালো হয়। তুমি গল্প লিখতে পারো।

গল্প লিখতে কল্পনা করতে হয়। কল্পনায় যে সময় ব্যয় হয়, তা আমার কাছে অপচয় মনে হতে থাকল। সেই গল্প লেখা তাই সাথে সাথে শুরু করা হলো না। গল্প লেখার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে অনেক সময় লেগে গেল। দিনের পর দিন গেল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটল, মাসের পর মাস পেরুল, বছর গড়াল, অবশেষে পারলাম মনকে স্থির করতে। দেড় বছর পর, একটি মাসে লিখলাম একটি গল্পের দুইটি পর্ব। পরবর্তী মাসে শত পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেল। লিখলাম মনের কথা। আমার স্বপ্নের কথাগুলো। নিজের জীবন নিয়ে যা ভাবি, কল্পনা করি সেগুলো। আর আমার বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা। অনেকদিন পর একদিন হুজুরের কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে গল্প লিখতে বলেছিলেন। গল্প লিখতে শুরু করেছি।

একটি প্রধান চরিত্রে লিখতে গিয়ে সেই গল্প যে উপন্যাস হয়ে গেল! শুনে হুজুর হাসলেন।

মহান আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করছি। তিনিই আমাকে লেখার তাওফিক দিয়েছেন। তিনিই আমার মনে লেখক হওয়ার বাসনা জাগিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে উৎসাহিত করেছেন। যখনই হতাশ হয়ে পড়েছি, তাঁর কাছ থেকেই আশার আলো পেয়েছি। আমাদের জীবনে সব সফলতা তাঁরই ইশারায় আসে। আকাশের দান তাঁরই পক্ষ থেকে। তিনিই মনে ভালোলাগার সৃষ্টি করেন, তিনিই ভালোবাসা জন্মান। পুলকসঞ্চার করেন। আগ্রহ তৈরি করেন। তিনিই মনকে কল্পনাপ্রবণ করেন, সুন্দরের বীজ অর্পণ করেন। তিনিই আমাকে সুন্দর চিন্তা দিয়েছেন, আমার সুন্দর কল্পনাগুলোকে এগিয়ে নিয়েছেন। তাঁর অনুগ্রহেই আমার কলমে কালি ঝরেছে সুন্দরের বাণী হয়ে। ভুলগুলো আমার নিজের।

আমার বইয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি একজন মানুষের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আদীব হুজুরের প্রতি। যারা তাঁকে জানেন নিশ্চয় স্বীকার করবেন এমনটিই হবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি হয়ত কোনোদিন জানবেন না, আমিও সেই দশজনের একজন হতে চেয়েছি। আমিও সেই শত মানুষের একজন, যারা তাঁকে তাদের হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবেসেছে বলে ভাবতে ভালোবাসে। কীভাবে সাহিত্যচর্চা করতে হয়, সাহিত্যের সাধক হতে হয় অথবা কীভাবে একজন ভালোমানের লেখক হতে হয় তা প্রথম এবং সবচেয়ে সুন্দরভাবে জেনেছি আদীব হুজুরের লেখা পড়ে। লেখার প্রতি কিছুটা যা ভালোবাসা জন্মেছে তা আদীব হুজুরের লেখা পড়ে।

"আবার দেখা হবে" বইয়ের লেখক মাহদী হাসানাত খান ভাইয়ের প্রতিও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। একদিন তার কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার লেখা কোনো পত্রিকায় ছাপবার মতো হয়েছে কি না, তিনি বলেছিলেন– একশ' পার্সেন্ট। তারপর তিনি অনলাইনভিত্তিক পত্রিকা 'ডেইলি মাই নিউজ' এর বিভাগীয় সম্পাদক হওয়ার পর তাতে আমার লেখা গল্পের ছোটছোট পর্ব প্রকাশ করলেন। নিয়মিত যাতে আমার লেখা প্রকাশ হতে থাকে তার জন্যে আমি মেহনত শুরু করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! এভাবেই লিখতে লিখতে অনেক লেখা জমে গেল। তার মাধ্যমেই প্রকাশক রাকিবুল হাসান খান ভাইয়ের পরিচয় পেলাম। উনার ইমেইলে আমার গল্পের পাণ্ডুলিপি পাঠালাম অনেকটা অনিশ্চয়তার সাথে এবং আমাকে হতাশ হতে হলো না। কৃতজ্ঞতা জানাই বইটির প্রকাশক, সম্পাদক ও মাকতাবাতুল হাসান-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে। আর একজন মানুষের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তিনি বিখ্যাত 'তিন গোয়েন্দা' সিরিজের লেখক রকিব হাসান। জানি না, আজও পৃথিবীর আলো-বাতাস তিনি পান কি না। আমি দু'আ

করি, আল্লাহ পাক তার ওপর রহম করুন। বলতে দ্বিধা নেই– এই বইটিতে অনেক ক্ষেত্রে আমি রকিব হাসানকে অনুকরণের চেষ্টা করেছি।

'সোফির জগৎ', 'কমলা সুন্দরী', 'ব্যাঙ বাহাদুরের দূর্গে'র বিখ্যাত দার্শনিক লেখক ইয়স্তেন গার্ডারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। যদিও তিনি জানবেন না, ভারত মহাসাগরের পাশের ছোট্ট একটি দেশের এক কিশোর উত্তর আটলান্টিকের পূর্বপাড়ে অবস্থানরত তাকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছে। তার মূল বই পড়িনি। তার বইয়ের অনুবাদ পড়েছি। দু'জন অনুবাদকের অনুবাদ পড়েছি, তাতে ইয়স্তেন গার্ডারকে একজন অসাধারণ এবং দারুণ লেখক না ভেবে পারিনি। তার লেখার শৈলীও আমি অনুসরণ করেছি। গল্প-উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারণা পেয়েছি ইয়স্তেন গার্ডার থেকে।

আমার উপন্যাসে ভূগোলের জ্ঞান বেশি কাজে লেগেছে। চুমকি ম্যাডামের প্রতি এজন্য আমার চিরকৃতজ্ঞ হওয়া চাই, কেননা ভূগোলের প্রতি আমার ভালোবাসা জন্মাতো না, যদি না ক্লাসে ম্যাডাম আমাকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। যদি না পাঠ্যবইয়ের সাথে প্রাসঙ্গিকতা ছাড়াই যাকিছু জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি সেগুলোর উত্তর দিতেন। অর্থনীতি এবং সমাজ বিজ্ঞানও কিছুটা কাজে লেগেছে, এজন্য সোলায়মান দেওয়ান স্যার এবং মশিউর রহমান মনির স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমার সৌভাগ্য যে, এই ছোট্ট জীবনের পুরো শিক্ষাকালেই আমি শিক্ষকবৃন্দের ভালোবাসা পেয়েছি।

সবশেষে চিন্তাশীল পাঠকের কাছে নিবেদন আমার চিন্তার ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। পাঠকের কাছে আমার আশা প্রশংসা নয়, সুচিন্তিত সমালোচনা। কেননা এমন বিষয়ের বিপরীতেও আমি লিখেছি, যা বিবেচিত হয়ে থাকে আধুনিক সমাজ এবং আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা হিসেবে। অথচ জানি যে, এখনই আমার চিন্তা-ভাবনা পরিপক্ব হয়ে উঠতে পারেনি। আমার ভালোলাগা, মন্দলাগা সার্বজনীন হতে পারে না, অন্তত যখন শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সে এখনোও আমি নবীন।

মাসউদ আহমাদ
masudahmad338@gmail.com

ওয়েসিস অফ দ্যা সিস

১.

"আমার কোনো বন্ধু নেই, খেলার সাথি নেই, নেই একজন কথা বলার সাথিও।" চোখের পানি দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বুকে, ভিজছে বুক। কাঁদছে আহমাদ, কথা বলছে কাকাতুয়া। কথা বলছে পাখি, একটি সুন্দর কাকাতুয়া। পাখিটি বসে আছে কাঁধে। রেলিং ধরে আহমাদ দাঁড়িয়ে আছে বড় এক জাহাজের ডেকে। দেখছে নীল আকাশ, নীল সাগর, দূরের রংধনু। মেঘের ভেসে চলা, আকাশে সাদা মেঘের ছুটে চলা। পূর্বের সকাল-সূর্যের আলোর লুকোচুরি খেলা। সাগরে পানির ঢেউ, ফুলে-ফেঁপে ওঠা, বিশাল-সুবিশাল ঢেউ, ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস, ঢেউ-পতন।

মিষ্টি-কোমল রোদ লাগছে চোখে, কপালে, গালে, মুখে, বুকে। শরীর জুড়ে ভালোলাগা শিহরিত, আহমাদ কাঁদছে তবু।

পাখির ডানা লাগল আহমাদের গলায়। সুড়সুড়ি হলো। ঝাপটা মেরে উড়ে গেল পাখি। আহমাদ তার কাঁধে একটি হাত অনুভব করল।

আহমাদ ঘুরে দাঁড়াল। তার সামনে একজন বৃদ্ধ মানুষ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছো কেন?

তখনই গড়াল দুই অশ্রুফোঁটা। তবে হেসে উঠল আহমাদ। বলল, "পাখিকে দু'বাক্য তো আমিই শিখিয়েছি!"

বৃদ্ধ মানুষটির প্রশস্ত কপাল কুঞ্চিত হলো। ওড়াউড়ি করা পাখিটির দিকে উঠল তাঁর চোখ। তাকালেন আহমাদের চোখে, তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান! তা তোমার বন্ধু নেই কেন? অথচ এখানে তোমার কত সমবয়সি, সহপাঠী আছে।"

"আমার বয়সি তো অনেকেই আছে। এখানে আমার অনেক সহপাঠী আছে। কিন্তু তারা কেউ আমার বন্ধু নয়। কেননা, পড়ালেখার প্রতি তাদের কারোই গভীর আগ্রহ নেই, যে আগ্রহ শিক্ষার্থীকে শেকসপিয়ার, জর্জ বার্নার্ড শ বানায়, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন বানায়। জীবন নিয়ে তাদের তেমন আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই, যে আকাঙ্ক্ষা মুচির ছেলেকে প্রেসিডেন্ট বানায়, আব্রাহাম লিঙ্কন বানায়। একসময়ের ইস্তাম্বুলের পথে পথে লেবু বিক্রি করা কিশোরকে বানায় রজব তায়্যিব এরদোগান। সত্যি, সমবয়সি বা সহপাঠী অনেক। কিন্তু তাদের কাউকে আমার ভালো লাগে না। আমার মনের মতো কেউ না।"

"তোমার পরিচয়?" বৃদ্ধ মানুষটি জিজ্ঞেস করলেন।

হেসে আহমাদ জবাব দিল, "আমি সৌভাগ্যবান।"

ঠিক সে সময় বৃদ্ধ মানুষটির পেছন থেকে একটি মেয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটল। মেয়েটি এগিয়ে এসে একটি টুকরো কাগজ আহমাদের হাতে ধরিয়ে দিল।

বিস্ময়ে 'হা' হয়ে আহমাদ তাকিয়ে আছে!

খানিক বাদে আহমাদ তার চোখ মেয়েটির চোখ থেকে হাতের কাগজে নামিয়ে আনল।

পড়া শেষ দিয়েই এমন সুন্দর করে হাসল আহমাদ, সত্যিই সে এক চমৎকার নির্মল-নীরব হাসি। তার ঠোঁটের ফাঁকে উপরের পাটির দুইটি দাঁত ঝিকমিক করে উঠল! ছেলেরাও এমন সুন্দর হাসতে পারে যে, মেয়েটির বুঝি সেকথা জানা ছিল না। তাই দু'চোখ পিটপিট করল সে। আর মনেমনে বললও যেন, "কে বলবে বলো, এখানে এ একটু আগেই একাকী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল ছেলে!"

আহমাদ কথা বলছিল, তখন বৃদ্ধ মানুষটির পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুতহাতে সে লিখেছিল– "আমার কোনো বন্ধু নেই, আমার নেই খেলার সাথি। আমার সাথি নেই, একজন কথা বলার সাথিও। আমার সমবয়সি অনেক আছে। আমার আছে অনেক সহপাঠী। কিন্তু একজন মাত্র বন্ধু নেই। সমবয়সি এবং সহপাঠী অনেক, শুধু নেই মনের মতোন একজন কেউ।"

"অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে আমার। আছে পড়া-লেখার প্রতি তীব্র ভালোবাসা এবং ভালোবাসার তীব্রতা। হৃদয়ে গভীর অনুরাগ এবং অনুরাগের গভীরতা।"

"তুমি আমার বন্ধু হবে?"...

২.

"সে শহর কামা নদী তীরে,
জানি নে গো হারিয়েছি ভীড়ে!"

আহা, কোথায় যেন পড়েছি কোথায় পড়েছি?

আলে..

হ্যাঁ-হ্যাঁ, আলেক্সেই, ম্যাক্সিম গোর্কি। ম্যাক্সিম গোর্কির 'আমার ছেলেবেলায়'।

তারপর কী?

"হাতে তার পাবে না নাগাল;
পায়ে হেঁটে শুধুই নাকাল!"

হাসল আহমাদ, সেই নীরব হাসি। হালকা-খুশির আলো-আভা ছড়িয়ে পড়ল মুখে। মুখে, ঠোঁটে, চোখে, গালে এবং কপালে। এ হাসির আল্পনা খুবই সুন্দর।

ভারি সুন্দর দেখায়। মন ভরে ওঠে। বুকের কোথায় যেন কেমন ভালো লাগা অনুভব হয়, অনেক ভালো লাগা।

আনমনা হলো, আবার কেমন সজাগ হলো। আনমনা-উদাস আঁখির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ-তীব্র হলো। হঠাৎ তেমন কী হলো? একটি শব্দ, যেন বুকের গভীর, গভীরতর কোথাও থেকে বের হয়ে এলো, টানা কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, "আ-শ্চ-র্য!" আওয়াজ কানে যেতেই আহমাদ চমকে উঠল যেনো। একটু অবাক চোখেই তার মুখের দিকে তাকাল। সে বলে চলেছে।

যখন জিজ্ঞেস করেছি, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" তোমার আবৃত্তি শুরু হলো ম্যাক্সিম গোর্কির কবিতা। পরিচয় জানতে চাইলে, তুমি পরিচয় দিলে, এক কথায় বললে, "আমি সৌভাগ্যবান!"

মুখে হাত-চাপা দিল আহমাদ। বসা থেকে পেছনে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে। খোলা আকাশের নিচে উল্টানো আকাশে, খোলা সাগরের বুকে ফুরফুরে খোলা বাতাসে বসার জন্য, শোয়ার জন্য, ঘুমোনোর জন্য বানানো একটি বেদীতে। কাঁপছে, কাঁপছে সে; হাসছে আহমাদ।

মেয়েটি আস্ত 'হা' করে তাকিয়ে রইল। ধীরে-ধীরে মুখটা উজ্জ্বল হলো। মনে মনে যেন বলল, "কী হাসিরে বাবা!" তারপর অল্প সময়। আহমাদ উঠে বসে গেল। "আশ্চর্যের কী? একটু রসিকতা করেছি।"

"ঠিক। আশ্চর্যের তেমন কিছু না।"
আবার নজর তার কড়া হলো। "কিন্তু" বলল সে, "একেই তুমি বন্ধুত্ব বলো?"
এবার 'হা-মুখ' বন্ধ হলো আহমদের। সত্যিই চমকে গিয়েছে এবং কেমন চুপসে গিয়েছে।
টিক্-টিক্-টিক্-টিক্। কয়েকটি সেকেন্ড। আহমাদ ধাতস্থ হলো। ধীর আওয়াজে বলতে লাগল।
বন্ধুত্বের জন্য পরিচয়ের কতটা প্রয়োজন, আমি জানি। এ সত্যিটা যেমন বিশ্বাস করি, আমি মানি। কিন্তু, কীভাবে চাইতে পারি, কাউকে বন্ধু হিসেবে পেয়েও আবার হারিয়ে ফেলতে? আমি আমার নাম, আহমাদ!

চোখ ফিরিয়ে নিল মেয়েটি। তাকাল সামনে, দৃষ্টি ছুটে গেল দূর দিগন্তরেখায়। দিগন্ত-বিস্তৃত সুবিশাল সীমারেখায় শুধুই জলরাশি। এখন শান্ত মহাসাগর। ঢেউহীন, স্রোতহীন। নেই ফেরেলের, বাইস ব্যালটের সূত্রের বায়ুর প্রবাহ-গতি। ওই যে দূরে, কী ওগুলো দেখা যাচ্ছে? দ্বীপ? হয়তো। এ যে নীল মহাসাগর, তাঁর বুকেও সবুজের উদ্যান, সুন্দর সবুজ দ্বীপ। এ সাগর-মহাসাগরে কত দ্বীপ-উপদ্বীপ

এভাবে ছড়িয়ে আছে? জানে কেউ ? নাহ্! কেউ না, শুধু সমস্ত পৃথিবীর, মহাবিশ্বের যিনি প্রভু।

"তুমি তোমার নাম বলোনি, আমাকে তোমার পরিচয় দাওনি, তুমি চাওনি আমি বুঝতে পারি আমার এবং তোমার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। কোনোভাবে তুমি জেনে গিয়েছ যে তোমার বন্ধুত্ব প্রত্যাশী এ মেয়েটি মুসলমান নয়। কিন্তু কীভাবে জেনেছ? হ্যাঁ, বুঝেছি– বিশপের মতো দেখতে মানুষটির সাথে ছিলাম যে! ভেবেছ কি না আমি তাঁর আপন কেউ হয়তো হব। তোমার ধারণা আরো অভ্রান্ত হোক, তিনি আমার দাদু।" দেখতে দেখতেই বলল সে। "আরি!" পরক্ষণেই টের পেল, সে এখানে একা-একাই বলছে কথাগুলো। দাঁড়িয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল বেশ দূরে চলে গিয়েছে। ওদিকে, ওই সিঁড়িঘরের দিকে। দেখেই দৌড়ল সে। "আহমাদ!" ডাক দিল।

"তোমাকে আমার কিছু স্বপ্নের কথা বলি।" হাঁপিয়ে, আহমাদের কানের কাছে মুখ এগিয়ে হাঁসফাঁস গলায় বলল সে। "হাতে হাত ধরে ধীরে ধীরে এসো, পথ চলি!"

৩.

ঘুমিয়ে ছিলাম। যখন কোনো এক অদৃশ্য উৎস থেকে এভাবে আওয়াজ পেলাম, "এই যে কিশোর! বই যে তোমার বালিশ হলো!" আর ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ মেলে সোজা হয়ে বসলাম এবং বেশ অবাক হলাম। সামনে আমার বই খোলা। বাহ! বেশ– স্বপ্নেও দেখি, পাই নির্দেশনা!
পড়তে বসে কামাই করেছি, বইকে বালিশ বানিয়ে তার ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে গিয়েছি।
হাতের ঘড়িটায় তাকিয়ে দেখতে পেলাম, রাত তিনটা বেজে বাইশ মিনিট। তা বাবা, ঘুমের রাজ্যের তুমি যে-ই হও না কেন, আমি আবার অত অকৃতজ্ঞ নই, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। তবু, এই একটু আগে যদি আমাকে জাগিয়ে দিতে!

কিন্তু, কিন্তু একি!!

চোখ দু'টি কচলে নিয়ে সামনে তাকিয়ে যাকে বলে হা হয়ে গেলাম! আমার টেবিল, তার সামনের যে অংশটি বইয়ের তাক, সেটি নেই! হ্যাঁ, নেই!! আমি, আমি কোথায় এসে বসে আছি? এক বিরাট টেবিলকে সামনে রেখে আমি বসে আছি।

টেবিলটার এক মাথায় বসে আছি।

বাহ!!
টেবিলে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশজন ডানে, বামে? বামেও তাহলে পঁচিশ! সোজা সামনে একটি চেয়ার, খালি। আরো সামনে, অ-নে-ক দূর তো বটেই, চলে গিয়েছে একের পর এক লম্বা নাতিপ্রশস্ত টেবিলগুলো।

টেবিলের দু'পাশে-দু'পাশে পঞ্চাশজন করে প্রত্যেক টেবিলেই বসা শিক্ষার্থীরা। মানে,
এখানে, এখানে রয়েছে শতসহস্র ছাত্রছাত্রী! তবু কী আশ্চর্য এক নীরব পরিবেশ! পড়ছে সবাই, আর কী সে মনোযোগ, কী তার মনোযোগের গভীরতা! আহ, দারুণ! চোখ জুড়িয়ে দেওয়া এ দৃশ্য!

চক্ষু শীতল করা এ দৃশ্য! হৃদয়-মন ভরিয়ে দেওয়া এ দৃশ্য! সত্যি, সত্যি-ই! এর কোনোই তুলনা হয় না!

তাকের পর তাক, দৃষ্টিসীমার শেষ নাগাদ শুধুই বইয়ের তাকগুলো। সামনে, ডানে, বামে, পেছনে পেছনেও? পেছন ফিরেই আবার অবাক হলাম। একটি, না, একজন মেয়ে, তাকিয়ে আমার দিকে। দু'চোখ জুড়ে কেমন স্বপ্নময় আলো! তাকিয়ে তো আছে নিষ্পলক সেই তাকিয়ে থাকা।

ভাবলাম, নিশ্চয় এখনো ঘুমিয়েই আমি, সেই সাথে জেগেও বটে। ঘুমের ভেতরে জেগে উঠেছি, ঘুমের মাঝেই আমি জেগে আছি। ঘুমের জগতের স্বপ্ন সাম্রাজ্যের আমি প্রবেশ করেছি, কোনো এক মহলে শাহ! শাহী মহলেই হয়তো এ কুতুবখানা। তা না হয়তো, এই যে এখানে শাহজাদী!
স্বপ্ন! আমার স্বপ্নগুলিও যা সুন্দর না!
আহ! স্বপ্ন যদি জীবন হতো! জীবনটা মোর স্বপ্ন!?
ভাবতে আমার ভালো লাগে। আমি ভাবি, নিজেকে নিয়ে কতকিছুই না ভাবি। আমার ভাবনাও যে একটি রূপ। ভাবতে আমার ভালো লাগে খুব।

আমি জানি না, আমার ভাবনা কখনো সত্যি হবে কি-না। আমি তো সত্যিই জানি না, আমার 'ভাবিতরূপ' আর 'ভাবনা-চেতনা' কোনো দিন বাস্তব হবে কি-না। সূর্যকিরণ পড়বে কি-না আমার 'ভাবনা মুখে'। প্রকৃত হাওয়া লাগবে কি-না আমার 'ভাবনারূপে'।

নিজের ব্যাপারে জানি না যখন, আমি সে ভাবনাকে এখন কেন প্রকাশ করবো না! আমার ভাবনা-চেতনায় যদি অন্য কারো হৃদয় জাগে?! যদি অন্য কারো মাঝে তা বাস্তব হওয়ার সম্ভাবনা খুঁজে পাই?! আমার ভাবতে যা ভালো লাগে, আমি যা ভাবতে ভালোবাসি; আমি তা ফুটিয়ে তুলতে চাই একটি কাল্পনিক চরিত্রের

মাধ্যমে। আমার ভাবতে যা ভালো লাগে, আমি যা ভাবতে ভালোবাসি; আমার ভাবনা-রূপ আমি দিয়ে দিলাম এ ছেলেটিকে। তার নাম আহমাদ।
"উঁউহ্!"
"আহমাদ!" মেয়েটি চমকে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই আ-হা-হা করে হাসতে লাগল। কী ভেবে আহমাদ হঠাৎ নিজের হাতে নিজেই এতো জোরে চিমটি কেটেছে, মুখ ফসকে আওয়াজটা বেরিয়ে গিয়েছে। মানে মানে, এটা তাহলে ঘুম নয়? স্বপ্ন নয়?

৪.
কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বইটি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল আহমাদ। জিজ্ঞেস করল, "তুমিই অ্যামেলিয়া, না?"
হাসি থেমে গেল, জবাব দিল, "হ্যাঁ।" একটু থেমে আবার বলল, "কীভাবে জানলে যে আমিই অ্যামেলিয়া? আমার তো মনে পড়ছে না তোমাকে নামটি বলেছি কখনো, যেহেতু নাম জানার প্রয়োজন তোমার হয়নি।"

মাথা দুলিয়ে আহমাদ বলল, তা ঠিক বলেছ। অবশ্য কাউকে জিজ্ঞেস করিনি। এই যে এই বইটি, পড়তে বসার পর আমাকে বলেছে ও। তার রচয়িতা কি না একজন মেয়ে, নাম অ্যামেলিয়া।" টেবিলের বইটি দেখিয়ে বলল সে।

"কেন পড়ব ভূগোল?" বইয়ের নামের ওপরে একটি শব্দ "অ্যামেলিয়া", লেখিকার একশব্দে নাম। আহমাদ বলতে থাকল, "ভূমিকা তোমার দাদুর লেখা। তিনি লিখেছেন, আমার নাতনির এ বইটি আমাকে পুলকিত করেছে। এ অল্প বয়েসে যে এমন একটি সুন্দর বই সে লিখতে পেরেছে, তাতে আমার আনন্দই লাগছে।"

"কেন পড়বো ভূগোল, তা আমারও জানার প্রয়োজন ছিল। কয়েকবার পড়লাম এ বই। তোমার বক্তব্যের সবই বুঝেছি, তবে অনেকগুলো প্রশ্ন যেগুলো মনের মধ্যে জেগে উঠেছে সেসবের সমাধান এখানে নেই। আশা করি, এটুকু সময় তোমার হবে, যাতে তোমার কাছ থেকেই সব সমাধান পেতে পারি।"

অ্যামেলিয়া বলল, "হবে সময়, যদি না সক্রেটিসের মতো প্রশ্ন শুরু করো।"
হালকা হাসির আলো ফুটেই আবার মিলিয়ে গেল আহমাদের ঠোঁটে। নিশ্চয় সে বুঝতে পেরেছে অ্যামেলিয়া তাকে কী বোঝাতে চেয়েছে। ক্লাসে আহমাদ অনেকটা সক্রেটিসের মতোই প্রশ্ন করতে শুরু করে দেয়। বর্তমান সময়ের কিশোর সক্রেটিস উপাধিপ্রাপ্ত এখন সে। আর উপাধিটা অবশ্যই অ্যামেলিয়ার দাদু তাকে দিয়েছে।